ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সামনে এখন দুটি বড় চ্যালেঞ্জ

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর আমাদের ইতিহাসে সব থেকে সাফল্যজনক ঘটনা হচ্ছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল বিজয়। আমরা জাতি হিসাবে ছোট বড় অনেক সাফল্য অর্জন করেছি, আমাদের দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, এমনকি রাজনীতিকদের হাজারো দোষ থাকলেও সরকার পরিচালনায় তারাও অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন, কিন্তু এতো বড় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমাদের জাতির কেউ এই প্রথম পেলেন। তাছাড়া ড. ইউনূসের সাথে নোবেল পেয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক, যার সাথে জড়িত এ দেশের প্রায় ৭০ লক্ষ নাগরিক। প্রতিষ্ঠানটিতে সরকারের শতকার ২৫ ভাগ অংশীদারিত্ব রয়েছে। ফলে এ বিজয় আমাদের পুরো জাতির। ড. ইউনূস পুরো জাতির জন্য একটি বিরল সম্মান এনে দিয়েছেন এবং জাতি অকৃপণভাবে তাঁকে নিয়ে উৎসবের জোয়ারে ভাসছে। সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির হুমকী সত্ত্বেও এবারের ঈদ তাই বাংলাদেশী জাতির জন্য এক ব্যতিক্রমী আনন্দ ও জাত্যাভিমানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে।

ড. ইউনুসের নোবলে বিজয় বাংলাদেশের অন্যান্য সাফল্যগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে জাতীয় আত্মবিশ্বাস তৈরীর পশ সুগম করেছে। ক্ষুদ্রঋণের মত আরও অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও কুসংস্কারমুক্ত মন-মানসিকতার দিক দিয়ে বাংলাদেশ শুধু এশিয়াতে নয় বরং সারা বিশ্বে মর্যাদার আসন পাওয়ার যোগ্য। আমাদের প্রতিবেশী দেশটিতে এমন কোন মাস যায় না যে মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না। এখনও সেখানে নারীদেরকে ধর্মের নামে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, প্রায়শঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদেরকে রাষ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় হত্যা করা হয়, তাদের নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয় ও তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং নির্বাচনের ইস্যূ হিসাবে সংখ্যালঘুদের ঐতিহ্যবাহী উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়। অসাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থান ভালো বলে প্রচার চালানো হলেও তাদের সাম্প্রদায়িক রূপটি বিগত বছরগুলোতে কোনভাবেই ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। তারা একটি বিশেষ ধর্মের পরম শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকছে, সে ধর্মানুসারী নারীদের থেকে তাদের পছন্দের পোষাক পরার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, তাদেরকে যাচ্ছেতাই বলে ঢালাওভাবে গালিগালাজ করছে এবং পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে সে ধর্মের অনুসারীদেরকে পদে পদে হয়রানি করছে। সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষা বিস্তার, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার প্রসার ইত্যাদিতে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। ড. ইউনূস তাঁর আন্তর্জাতিক পরিচিতি ব্যবহার করে বাংলাদেশের এ সকল সাফল্যের কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে পারেন। আমাদের সরকার, মিডিয়া এবং প্রবাসীরাও এ সুযোগে দেশের প্রকৃত ইমেজটি বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে এগিয়ে আসতে পারেন।

ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের তত্ত্বের বাস্তবরূপ দেয়া ও তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া ড. ইউনুসের সবথেকে বড় অর্জন হলেও একজন বাংলাদেশী হিসাবে তাঁকে যে কারণে খুব ব্যতিক্রমী ও আপন মনে হয় তা হচ্ছে, তিনি কীর্তিমান বাংলাদেশের রূপটি দেখতে পান এবং এ দেশকে নিয়ে অনেক সাহসী স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে পারেন। বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ তাঁর কলামে প্রায়ই এমন একজন নেতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন যিনি এদেশের মানুষের সম্ভাবনাকে দেখতে পান, তাঁদেরকে একটি

সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে পারেন এবং সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করার পথে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথা পেশাজীবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, এমনকি রাজনীতিকদের কেউ কেউ বললেও ড. ইউনূসের মত বিশ্বাস ও শক্তি নিয়ে কেউ সম্ভবতঃ বলতে পারছেন না। বেশ কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন যে ত্রিশ বছর পর বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে দীর্ঘ ভিসার লাইন থাকবে। নোবেল পাবার পর তিনি বলেছেন যে ত্রিশ বছর পর এদেশে দারিদ্র মিউজিয়াম তৈরী হবে। এদেশের অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে জাতি হিসাবে আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব। কীর্তিমান বাংলাদেশের রূপটি দেশের ভিতরে ও বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে তা আমাদেরকে আরও অনেকদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

তবে নোবলে বিজয় যেমন ড. ইউনূসের মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতির জন্য অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, তেমনি তাঁর সামনে দাড় করিয়ে দিয়েছে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারলে হয়তো সত্যি সত্যিই বাংলাদেশ তিন দশক পর দারিদ্র মিউজিয়াম তৈরী করতে পারবে এবং বাংলাদেশের ভিসার জন্য আমাদের দূতাবাসগুলোতে বিদেশীদের দীর্ঘ লাইন দেখা যাবে। অপরদিকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করতে পারলে তাঁর নোবেল বিজয় যেমন জাতির ভাগ্য উন্নয়নে যেমন কোন ভূমিকা রাখবে না তেমনি জাতিকে দীর্ঘস্থায়ী বিদেশী শাসন ও শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ করার সম্ভাবনাও রয়েছে। নিম্নে চ্যালেঞ্জ দুটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা অর্থনীতিতে একটি অত্যন্ত বড় আবিস্কার। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার পূর্বে পুজিবাদী সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসার তেমন কোন পথ ছিল না। দারিদ্র ছিল আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের অলঙ্ঘনীয় ভাগ্যলিপির মত, কোনভাবেই তার থেকে মুক্তি সম্ভব ছিল না। সামান্য কিছু অর্থ হলে উদ্যোগী মানুষেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলেও সে অর্থ জোগাড় করার কোন পথ তাদের ছিল না। প্রচলিত ব্যাংক তাদেরকে ঋণ দিতো না। ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্রের শিকল ভাঙ্গার একটি উপায় নিয়ে এসেছে।

কিন্তু বাস্তবে ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র বিমোচনে প্রাথমিকভাবে সফল হলেও শতভাগ কার্যকর হিসাবে প্রমাণিত হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের একটি অংশ দারিদ্রের শিকল ভাঙতে সক্ষম হলেও আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ দরিদ্র থেকে হতদরিদ্রে পরিণত হচ্ছে। রাজধানীতে ভাসমান মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেখা যায় একটি এনজিওর ঋণ শোধ করতে আরও কয়েকটি এনজিও থেকে দরিদ্রদেরকে ঋণ নিতে হয়। এ ঋণজালের পরিণতি হয় শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে পথে বেরিয়ে পড়া। তখন আর সে সকল হতদরিদ্রদেরকে এনজিওসমূহ ঋণ দেয় না।

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের কার্যকারীতার সীমাবদ্ধতার চিত্র এনজিও সমূহের দেয়া তথ্য থেকেই বেরিয়ে আসে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৬৬ লক্ষ। অর্থাৎ ৬৬ লক্ষ পরিবার প্রতিষ্ঠানটির ক্ষুদ্রঋণ এর থেকে উপকৃত হচ্ছে। ব্রাক, আশা ও প্রশিকার মত বৃহৎ এনজিওগুলোর বাইরেও রয়েছে সহস্রাধিক ক্ষুদ্রঋণপ্রদানকারী সংস্থা। এসকল সংস্থাসমূহ থেকে মোট দুই দুই কোটির মত পরিবার ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। অর্থাৎ ইতোমধ্যে ৮-৯ কোটি মানুষ, তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় পুরোটাই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় চলে এসেছে। বাংলাদেশে সম্ভবতঃ এমন কোন এলাকা নেই যেখানে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী কোন সংস্থা কাজ করছে না। শুধু তাই নয় অনেক এলাকাতে এনজিওসমূহের মধ্যে ঋণ দেয়া নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা রয়েছে। এর পাশাপাশি গত কয়েক দশকে রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামোগত

বিপুল উন্নয়ন হয়েছে। ক্রমবর্ধমানহারে দেশে আসছে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে গিয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। তৈরী পোষাক শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি দরিদ্র নারীদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। তারপরও বাংলাদেশ দারিদ্রমুক্ত হতে পারছে না। প্রতিবছর মাত্র এক শতাংশের মত মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে উঠতে পারছে। অপরদিকে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

ক্ষুদ্রঋণের জনক হিসাবে ড. ইউনুস হচ্ছেন ক্ষুদ্রঋণের এই সীমাবদ্ধতার কারণগুলো খঁজে বের করা ও তার সমাধানের চেষ্টা করার জন্য সবথেকে যোগ্য ব্যক্তি। ক্ষুদ্রঋণের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে তা অতিক্রমের পথ বের না করা গেলে কয়েকটি কারণে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ক. অস্বীকার করার উপায় নেই যে উচ্চ সুদের কারণে বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ একটি অতি লাভজনক ব্যবসা ও শোষণের নতুন হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ঋণ আদায়ের জন্য জামানত নেয়া হয় না বটে, তবে অনেকে ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানকারীদের পেশীশক্তি ঋণ আদায়ে জামানতের থেকে বেশী ভূমিকা রাখে। ঋণ দিতে না পারায় ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাওয়া কিংবা দুধেল গাভী কেড়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণজাল দরিদ্রকে হত দরিদ্র ও সম্বলহীন করছে।

খ. হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেলে দেশে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও হত্যাকান্ডের একটি বড় অংশ সংঘটিত হচ্ছে তাদের দ্বারা যারা ভাসমান জীবনে বেড়ে উঠছে।

গ. ক্ষুদ্রঋণের অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসছে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ থেকে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বিদেশী ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ার ফল দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য সহায়ক হবে না। পশ্চিমের দেশগুলি দ্বারা ইরাক ও আফগানিস্তান দখল এবং বাংলাদেশের মত অনেক দেশ থেকে মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাচারের ঘটনার পর এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না যে দেশসমূহ শুধুমাত্র মানবকল্যাণের মহান ব্রত নিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করে চলেছে।

২. এমন এক সময়ে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হলেন যখন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি ক্রান্তিকাল চলছে। এটি এমন একটি সময় যখন একদিকে যেমন দেশে গণতন্ত্র শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেতে যাচ্ছে, অপরদিকে তেমনি গণতন্ত্রের নামে তারই বিকল্প খোজা হচ্ছে। এ মুহূর্তে একটু ভুল হলেই জাতি গভীর সংকটে নিপতিত হতে পারে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় মিলে এই ক্রান্তিকাল তৈরী করেছেঃ

ক. পরপর তিনটি সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন করেছে। তাছাড়া হরতালের মত গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর গণতান্ত্রিক হাতিয়ারগুলো ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে রাজনীতিকে ক্রমান্বয়ে রাজপথ থেকে পার্লামেন্ট, মিডিয়া ও অলোচনার টেবিলে নিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন সংস্কার নিযে সৃষ্ট সামনের সংকটটি সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারলে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে বলে আশা করা যায়।

খ. একদিকে যেমন শত নেতিবাচক প্রচারণাকে মাড়িয়ে গণতন্ত্র এগিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তেমনি একটি শক্তিশালী নিরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়াও বেশ কয়েকবছর ধরে চলে আসছে। প্রধান চারটি দলের মধ্যে তিনটিরই নেতৃত্ব চলে গেছে ব্যবসায়ী, সাবেক আমলা ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে। রাজনীতিকরা সেখানে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। অষ্টম জাতীয় সংসদে ৮৪% সংসদ সদস্য ছিলেন ব্যবসায়ী। যে গুটিকয়েক রাজনীতিক সংসদে যেতে পারছেন তাদের পথটিও রুদ্ধ করতে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। দেশের কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে সুশীল সমাজ আখ্যা দিয়ে তাদেরকে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরীতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। নেতৃস্থানীয় একজন সুশীল কিছুদিন আগে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টের প্রসঙ্গে বলেছেন যে বাংলাদেশে রাজনীতিকদের প্রতি ব্যবসায়ীদের আস্থা নাকি শূন্যের কোঠায়। তাঁর বক্তব্য শুনে প্রশ্ন জেগেছে যে রাজনীতির ৮৪ শতাংশই তো ব্যবসায়ীদের দখলে, তাহলে কে কার প্রতি আস্থাহীন। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাজনীতিকদের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করে গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিপন্ন করার প্রচেষ্টা চলছে।

গ. নির্বাচন সংস্কারের দাবী এমন একটি পর্যায়ে চলে এসেছে যাকে কোনভাবেই গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও স্থিতিশীলতার সহায়ক বলা যায় না। সাদা চোখে যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী যিনি কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান হওয়ার কথা বিরোধী দল তাকে মানতে প্রস্তুত নয়। শুধু তাই নয়, এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ঠেকাতে বিরোধী দলের নেতারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিচ্ছেন যে সংবিধান নির্ধারিত ব্যক্তি দায়িত্ব নিলে দেশ অচল করে দেয়া হবে, সারা দেশ থেকে তাদের কর্মীরা রাজধানীতে লাঠি সোটা নিয়ে এসে রাজধানী দখল করে ফেলবে। অনেকেই সামনের দিনগুলিতে একটি রাজনৈতিক সংকট ও শূন্যতার আশংকা করছেন।

তিনটি ঘটনাকে মিলিয়ে দেখলে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তাতে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র যখন শক্তিশালী ভিত্তি পেতে যাচ্ছিল তখন তাকে ধ্বংস করার একটা সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। দুটি শাসক পরিবার ও তাদেরকে বিভ্রান্তকারী কিছু ব্যবসায়ী যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার সুযোগে কিছু বিদেশী শক্তি অনুগত সুশীল সমাজকে মাঠে নামিয়েছে। গণতন্ত্রের বিকল্প সৃষ্টি বা গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতা জনগণের হাত থেকে সরিয়ে গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সেই সকল বিদেশী শক্তি বেশী ভূমিকা রাখছে যারা গণতন্ত্রের সব থেকে বড় প্রবক্তা, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সাথে যাদের সবথেকে বেশী সখ্যতা। এর কারণ হচ্ছে একটি সামরিক বা সুশীল সরকারকে যত সহজে বশীভূত করা যায় গণতান্ত্রিক সরকারকে ততো সহজে পোষ মানানো যায় না। গণতান্ত্রিক সরকার জানে তার পিছনে জনগণ রয়েছে। জানে যে, ক্ষমতায় থাকতে হলে তাকে জনগণের কাছেই ফিরে যেতে হবে। ফলে বিদেশী চাপের কাছে মাথা না নোয়ানোর শক্তি ও বাধ্যবাধকতা উভয়ই তাদের থেকে থাকে। পারভেজ মোশাররফকে বুশ নাকি কার মাধ্যমে হুমকী পাঠিয়েছিলেন যে আফগানিস্তানের উপর আমেরিকান হামলাকে সমর্থন না দিলে আমেরিকা পাকিস্তানকে বোমা মেরে প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দিবে। সে হুমকীর নিকট তিনি সহজেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হলে তিনি এতো সহজে মাথা নোয়াতেন না বা নোয়াতে পারতেন না। গত কিছু দিনে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির মত ঋণদাতা সংস্থা বহুবার বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধি করতে। তাদের কঠোর প্রতিক্রিয়ার ভয়কে উপেক্ষা করে বাংলাদেশ তাদের চাপকে অনেকবার অগ্রাহ্য করেছে। কিছুদিন পূর্বে একটি খনিজসম্পদ উত্তোলনকারী কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়লে আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে সরকার কোম্পানীটির সাথে চুক্তি বাতিল করে দেয়। এদেশে অগণতান্ত্রিক সরকার থাকলে এ ধরণের বিদেশী চাপ অগ্রাহ্য করা সম্ভব হতো না।

নিরাজনীতিকরণ ও সুশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পিছনে বিদেশী শক্তিসমূহের আগ্রহের পিছনে এ সকল কারণ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কার একটি অত্যন্ত মর্যাদাসূচক পুরস্কার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর রাজনৈতিক ব্যবহারের কিছু নজির রয়েছে। রাশিয়ার গর্বাচভ, পূর্ব তিমুরের বোলো কার্লোস ফিলিপ জিমেনেস ও রামোস হোর্টা এবং তিব্বতের দালাইলামার মত অনেককেই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে পুজিবাদী শক্তিগুলো তাদের প্রতিরোধকারী শক্তিকে দূর্বল ও ছিন্ন ভিন্ন করার চেষ্টা করেছে। ১৯৯০ এর আগে পরের ঘটনাসমূহ যাদের মনে আছে তারা দেখেছেন যে কিভাবে পাশ্চাত্য মিডিয়া গর্বাচভকে রাশিয়ার ত্রাণকর্তা হিসাবে চিত্রিত করে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। এক পর্যায়ে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন এবং তার কিছুদিন পর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে টুকরা টুকরা করার কাজটি সম্পন্ন করেন। যে সোভিযেত ইউনিয়ন অর্ধ শতক ধরে বিশ্বের সবথেকে ধনী, প্রযুক্তিতে উন্নত ও মারণাস্ত্রে শক্তিশালী পশ্চিমা বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে এসেছে ত্রাণকর্তা গর্বাচভের গ্লাসনস্ট আর পেরেসত্রোইকার পর তার অবস্থা এ পর্যায়ে নেমে যায় যে দেশে এবং বিদেশে রাশিয়ান মেয়েদের একটি অংশের প্রধান জীবিকা হয়ে দাড়ায় পতিতাবৃত্তি।

ড. ইউনুসের নোবেল বিজয়ে যখন সারাদেশ আনন্দের জোয়ারে ভাসছে তখন এ ধরণের আশঙ্কার কথা হয়তো বেমানান শোনাবে। হয়তো কোন পত্রিকা এ প্রবন্ধ প্রকাশ করবে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্যের কৌশল হচ্ছে ভালো কিছুর মোড়কে খারাপ কিছুকে চালিয়ে দেয়া। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্লেটো বলেছিলেন, 'সবচেয়ে বড় শোষক-নিপীড়করা প্রথমদিকে সবসময় রক্ষক ও ত্রাণকর্তার পোষাকে আবির্ভূত হয়।' ড. ইউনূসের দেশপ্রেম ও দেশকে পাল্টে দেয়ার গভীর আগ্রহের সুযোগ নিয়ে তাঁর পশ্চিমের বন্ধুবেশীরা তাঁকে এমন কোন পথে যাতে ঠেলে দিতে না পারে যা দেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে সেদিকে তাঁকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলেছেন। রাজনৈতিক দল গঠন করে যদি সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারেন তাহেল তাঁর এ উদ্যোগকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে। কিন্তু যে দরিদ্র জনগণ ঋণ নেয়ার জন্য কোন একটি ঋণদানকারী সংস্থার কাছে যায়, তাদেরকে ঋণদানের শর্ত হিসাবে দলীয় কর্মীতে পরিণত করার চেষ্টা করা হলে তা কল্যাণকর হবে না। তাছাড়া আমরা আমাদের সকল স্মরণীয়-বরণীয়কেই বিতর্কিত করে ফেলেছি। রাজনীতি যদি এ দেশের এই শ্রেষ্ঠ ভূমিপূত্রকে বিতর্কের মধ্যে ঠেলে দেয় তাহলে তা থেকে দূরে থাকাই হয়তো জাতির জন্য অধিকতর কল্যাণকর হবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস নোবেল বিজয়ের মাধ্যমে পুরো জাতির জন্য যে বিশাল গৌরব এনে দিয়েছেন সে জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাঁর সামনের এ দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তাঁর অতি প্রিয় এ জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।